১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের পর ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এর পদ চিহ্ন অনুসরণ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ এ স্বাধীনতা ঘোষনার মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর বাংলদেশ স্বাধীন হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে আর্থ-সামাজিক, অর্থনেতিক, কৃষি, শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো পুর্নগঠন করার জন্য সরকারের পাশাপাশি যখন সমবায় আন্দোলনকে পথ প্রর্দশক এর ভূমিকায় অবর্তীণ হবার কথা, তখন বিদেশী সাহায্য ভিত্তিক কিছু বেসরকারী সংস্থা সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা দেশ গঠনের দোহাই দিয়ে সরকারকে সামনে রেখে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা গুঁছিয়ে নিতে থাকে। তারা শিল্প ও কৃষি ভিত্তিক উন্নয়নকে পাশ কাটিয়ে, শিল্প নির্ভর অর্থনীতি গড়ার বদলে, দাতা নির্ভর একটি সেবা খাতের উন্নয়ন ঘটাতে থাকেন। ফলে দেশ ধীরে ধীরে দাতা নির্ভর হয়ে পড়ে। তাই আজ আমাদের দাতা নির্ভর ঘাটতি বাজেট করতে হয়। দেশের তথা সমাজের ব্যর্থতার এ দায়ভার দেশের সরকার ও সমবায় সংগঠদেরই নিতে হবে।

যে উন্নয়ন দেশীয় সমবায় সংগঠক ও সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল, সমবায় তা পারেনি। অথচ একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই সুন্দর, সুখী ও রবার্ট ওয়েনের সাম্যতার গ্রাম গঠন সম্ভব। সমাজ থেকে দুঃখ, অভাব, অনাহার ও বিশৃংখলা দুর করে সুন্দর স্বপ্নের সমাজ গড়া সম্ভব। এটা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন তারা।

আজ বাংলাদেশে প্রায় ১৫০,০০০ অধিক নিবন্ধিত সমবায় সংগঠন রয়েছে। দেশ গঠনে, দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে পরিমান অবদান রাখার কথা ছিল তা তারা করতে ব্যর্থ হন। তার প্রধান কারন হলো সত্যিকারের সমবায় আন্দোলন তথাকথিত সমবায় সংগঠদের মধ্যে প্রবেশ করেনি। তারা সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন, হয় নিজের স্বার্থে নয়তো লোক দেখানোর জন্য। দেশ গঠন তাদের উদ্দেশ্য নয়। দেশের আজ এক চর্তুথাংশ সমিতি সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠন গুলো হয় সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল নয়তো অবৈধ কর্মকান্ড চালিয়ে রাতারাতি বড় হবার চিন্তা করছে। নিজের স্বার্থ হানির আশঙ্কায় নিজেদের মধ্যে সব সময় সন্দেহ কাজ করে। ফলে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে নেতৃত্বের বিশৃংখা এবং সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত বা সমিতি ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। সমিতির নির্বাচন সমিতি ভাঙ্গনের একটি বড় নিয়ামক। দেশে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সংগঠন রয়েছে তার মধ্যে সঞ্চয় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গুলো হলো একটি। সমবায়ের সাথে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর প্রধান পার্থক্য হলো - ক্রেডিট ইউনিয়ন স্বেচ্ছা প্রনোদনায় গঠিত এটি প্রতিষ্ঠান। এ সংগঠনে তাদের সমান অংশীদারিত্ব। এখানে সমবেত হয় বিভিন্ন বয়স আর পেশার মানুষ। তারা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোত্র, জাতি বা এলাকার লোক, সমবেত হয়ে ধনী, গরীর, ছোট-বড় সবাই একসাথে সমবেত হয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনে অবদান রাখার চেষ্টা করেন। আর সমবায় সংগঠন হলো সরকারী অনুদান লাভের আশায় বা সরকারী পৃষ্টপোষকতায় গঠিত কোন সমবায় সংগঠন।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন প্রায় শত বছরের। সেখানে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন মাত্র ৬০-৬৫ বছরে। কিন্তু দেশ ও জাতি গঠনে সমবায়ের অবদান অন্যান্য আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশী। তবে এ অবদান আরো অনেক বেশী হতে পারতো। এ ত্রে যতটুকু অর্জন তা শুধুমাত্র কিছু চিন্তাশীল সমাজ নেতা ও সমবায় সংগঠকের জন্য। তাদের অবদানকে আমরা কোন দিন সমবায় আন্দোলন থেকে মুঁছে ফেলতে পারবোনা। সমবায় আন্দোলনের কথা বলতে গেলে তাদেরকে আমাদের স্মরণ করতেই হবে।

বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের আগমন ঘটে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের হাত ধরে। বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির একমাত্র ও প্রথম উদ্ভাবক হলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি। ১৯৫০-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাওয়াল এবং আঠারোগ্রামের প্রায় প্রতিটি মিশনেই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে প্রায় সমস্ত মিশনই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের আওতায় চলে আসে।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর দশটা এলাকার মতই অন্যান্য খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা প্রধান উৎস ছিল কৃষি কাজ। কোন কোন এলাকার মানুষজন আগে থেকে চাকুরি নির্ভর ছিল। চাকুরিজীবি পরিবারগুলোর অবস্থা বাদ দিলে জমিতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করেই জীবন যাপন করতে হতো অন্যদের। খ্রিস্টানদের পারিবারিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ততোটা স্বচ্ছল ছিলনা। যে বছর মৌসুমী বৃষ্টি সময় মত হতো, সে বছর তাদের ক্ষেতে ফলতো সোনার ফসল। সে বছর তাদের মুখেও থাকতো হাসি। এতো চেষ্টার পরেও আমাদের বেশীর ভাগ পরিবার ছিল অস্বচ্ছল ও আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে। তাই পারিবারিক কোন বড় ধরণের কাজ যেমন-বাড়ী তৈরী, ছেলে বা মেয়ের বিয়ে, বাবা-মা বা ছেলে-মেয়েরা